গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৫ - ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ — ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

মহান নেতা মাও সে-তুঙ স্মরণে

''সকল দেশের জনগণ, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই আজ হোক আর কাল হোক, বিপ্লব চাইবেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমর্থন করবেন। সংশোধনবাদকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন না। কিছু মানুষ অল্প কিছুদিনের জন্য সংশোধনবাদের পক্ষে যেতেও পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সংশোধনবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের দাঁড়াতেই হবে, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তাঁরা বাধ্য হবেন।''

সিঙ্গুর প্রশ্নে শ্রেণীস্বার্থে একদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যদিকে দেশের গরিব চাষি খেতমজুর শ্রমিক মধ্যবিত্ত

১ সেপ্টেম্বর ধরনা সমাবেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার দাবিতে সিঙ্গুরের ধরনায় প্রথম দিন থেকেই এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। প্রথমদিনই ধরনায় মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগ দেন কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কমরেড সৌমেন বসু। পরেও একাধিকবার কমরেড মানিক মুখার্জী গিয়েছেন, কমরেড সৌমেন বসুও যাচ্ছেন। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সলিল চক্রবর্তীও যান। একটানা সেখানে রয়েছেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক, কমরেড সদানন্দ বাগল। এ ছাড়াও হুগলি জেলার পার্টি সংগঠক ও কর্মীরা ২৪ ঘণ্টা এস ইউ সি আইয়ের ক্যাম্পে ও মূল ধরনা মঞ্চে আছেন। প্রতিদিন নানা জেলা থেকে পার্টি ও গণসংগঠনগুলির কর্মী-সমর্থকরা মিছিল করে আন্দোলনের সমর্থনে সেখানে সমবেত হচ্ছেন। সেখানে অনেকেই কমরেড প্রভাস ঘোষের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেছেন। ১ সেপ্টেম্বর কমরেড প্রভাস ঘোষ ধরনামঞ্চে উপস্থিত হলে মমতা ব্যানার্জী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর উপস্থিতি মাইকে ঘোষণা করেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন ঃ

২৪ আগস্ট থেকে আজ অষ্টম দিন পর্যন্ত আপনারা ঝড়-বৃষ্টি-রোদ উপেক্ষা করে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালাচ্ছেন। আমি সর্বপ্রথমে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এই ধরনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। আপনারা জানেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আমাদের দল দীর্ঘদিন আন্দোলন করে যাচ্ছে। এই সিঙ্গুরের আন্দোলনে প্রথম দিন থেকেই আমাদের দল আছে। এর মধ্য দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের ঐক্য গড়ে ওঠে। এরপর নন্দীগ্রামে তা সম্প্রসারিত হয়, এখন রাজ্যস্তরেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আপনাদের এই আন্দোলনের তাৎপর্য সিঙ্গুরের ৪০০ একর জমি উদ্ধার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গোটা পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি গরিব মানুষ তাকিয়ে আছে এই আন্দোলনের দিকে, গোটা দেশের সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষ এই আন্দোলন থেকেই প্রেরণা পাচ্ছে। এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ছবিটা আজ পরিষ্কার। একদিকে রয়েছে টাটা, আম্বানি, গোয়েঙ্কা এই ধরনের দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণী এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা, যার হয়ে কাজ করছে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির মতো দল ও সরকারগুলো। অন্যদিকে আছে ভারতবর্ষের কোটি কোটি গরিব কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত মানুষ। এইভাবে গোটা দেশ এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে আজ বিভক্ত হয়ে আছে। ফলে সরকার এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যতই অপপ্রচার করুক, একে ভাঙতে পারবে না। আপনারা লক্ষ্য করছেন, গতবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে ভাঙতে প্রথমেই লাঠি-গুলি চালিয়ে গণহত্যা করেছিল সরকার। এখানে রাজকুমার ভুল, তাপসী মালিককে খুন করেছিল। নন্দীগ্রামে গণহত্যা চালিয়েছিল, ক্রিমিনালরা ধর্ষণ করেছিল বহু নারীকে। তা সত্ত্বেও তারা আন্দোলনকে ভাঙতে পারেনি, বরং অত্যাচার যত বেড়েছে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়েছে, দৃঢ় হয়েছে। তাই এবার তারা কৌশল পাল্টেছে। এবার সিপিএম সরকার ভাব দেখাচ্ছে, তারা আলোচনা করতে চায়। এটা বিরাট ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী মধ্যরাত্রে হোটেলে গিয়ে টাটার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে পরামর্শ দিলেন। পরদিনই টাটা হুমকি দিল তারা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাবে, অন্য পুঁজিপতিরাও চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদমাধ্যমগুলোকে দিয়ে হাওয়া তুলে দেওয়া হল যে, পশ্চিমবঙ্গে আর শিল্প হবে না, সব মরুভূমি হয়ে যাবে। আমরা বলতে চাই, টাটা এখানে দয়া করার জন্য আসেনি। কোনও পুঁজিপতিই সেজন্য আসে না, তারা আসে লাভ করার জন্য, লুণ্ঠন করার জন্য। পুঁজিপতিরা যতদিন সস্তায় শ্রমিক, কাঁচামাল পাবে, বাজার পাবে, লাভের সুযোগ পাবে ততদিনই তারা এখানে আসবে, পুঁজি ঢালবে, কেউ এখান থেকে যাবে না। এই হুমকিটা হচ্ছে আপনাদের বিভ্রান্ত করার জন্য। যে পুঁজির জন্য টাটার এই দম্ভ, যা তার তুলে নিয়ে যাবে বলছে, সেই পুঁজি কে সৃষ্টি করেছে? টাটাকে তা ভগবান দেয়নি, পুরুষানুক্রমে এদেশের হাজার হাজার শ্রমিক রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে এই পুঁজি সৃষ্টি করেছে। পুঁজিবাদী মালিকানার দৌলতে টাটা তার মালিক।

ওরা বলে আমরা নাকি শিল্পায়নবিরোধী। আমরা বলি, শিল্পায়নের নামে তোমরা ধাপ্পা দিচ্ছ,

আটের পাতায় দেখুন

বন্‌ধ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নিজ দলের নীতিই ব্যক্ত করেছেন — শঙ্কর সাহা

বনধ ও ধর্মঘট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে ২৭ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, ''আমরা সিপিএম দলের রাজনীতি ও শ্রেণীচরিত্র ভালভাবেই জানি। এই দল বর্তমানে দেশি-বিদেশি পুঁজির একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে কাজ করে চলেছে। তাই তারা পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি সহ সমস্ত শ্রমস্বার্থ-বিরোধী নীতি ও কার্যক্রম সরকারের মাধ্যমে প্রয়োগ করে চলেছে। সেই দলের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ধর্মঘট ও বন্‌ধের বিরোধিতা করাই বুদ্ধদেববাবুর পক্ষে স্বাভাবিক। সিপিএম পার্টি নেতৃত্ব সুচতুরভাবে মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে তাঁদের দলের বক্তব্য এভাবে বোঝাতে চাইছেন যে, সরকারের পক্ষে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের স্বার্থই সমানভাবে রক্ষা করতে হয়, যা ভারতবর্ষের সমস্ত বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলিই করে থাকে। দলের নিচুতলার কর্মীদের তাঁরা একথা বলেও বিভ্রান্ত করতে চাইছেন যে, দল শ্রমিকশ্রেণীর দলই আছে, তবে সরকার চালাতে গেলে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই কথা বলতে হয়। বাস্তবে বুদ্ধবাবু যখন বলেন, 'টাটাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে দেব না', অথবা 'বন্‌ধ ধর্মঘট চলবে না', 'ঘেরাও বেআইনি ও অনৈতিক' তখন তিনি সিপিএম দলের নীতিই ব্যক্ত করেন। এর দ্বারা বিস্মিত বা বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে লড়াই-ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী, শুধুমাত্র মালিকদের দালালরাই চিরকাল এর বিরোধিতা করে থাকে।''

রাজ্যজুড়ে বিদ্যুতের আলো বর্জন আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া

লাগাতার লোডশেডিং-এ ক্ষুদ্রশিল্প-ক্ষুদ্রব্যবসা ভয়ঙ্করভাবে মার খাচ্ছে, গার্হস্থ্য জীবনে উঠেছে নাভিশ্বাস, সেচের অভাবে চাষ মার খাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, চিকিৎসা পরিষেবা থমকে যাচ্ছে বিপজ্জনকভাবে। অথচ আইন অনুযায়ী প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ গ্রাহকরা পাচ্ছেন না। অত্যাবশ্যক এই পরিষেবা জনগণ তো পাচ্ছেনই না, উল্টে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো বিদ্যুতের দাম ভীষণভাবে বাড়িয়ে চলেছে, যা সমর্থন করে চলেছে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। রাজ্য সরকার নির্বাক দর্শক।

সর্বাত্মক এই আক্রমণে অতিষ্ঠ জনগণ 'অ্যাবেকা'র নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত ২৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টা থেকে আধঘণ্টা সারা রাজ্যে বিদ্যুতের আলো বর্জন করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাশহরে এবং কলকাতার ধর্মতলা, হাজরা, যাদবপুর, বেহালা, শ্যামবাজার, দমদম, বরাহনগর সহ সর্বত্রই বৈদ্যুতিক আলো বর্জন আন্দোলনকে সফল করার জন্য 'অ্যাবেকা'র সভাপতি সজ্জিত বিশ্বাস জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, যতদিন না রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর বিদ্যুৎ বিক্রি বন্ধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্থায়ীভাবে লোডশেডিং বন্ধের ব্যবস্থা করছে এবং ক্ষুদ্রশিল্প-ক্ষুদ্রব্যবসা ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে এক টাকা এবং কৃষকদের পঞ্চাশ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে, ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

২৭ আগস্ট মেদিনীপুর শহরে আলো বর্জনের সময় মোমবাতি মিছিল

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে
অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'র শ্রমিক সংগঠন গঠিত

সমস্যা জর্জরিত মানুষ আজ হোক, কাল হোক বাঁচার পথ খুঁজবেই। খুঁজবেই সংগ্রামের পথ, সংগ্রামের সঠিক লাইন এবং নেতৃত্ব। তারই নজির দেখা গেল বাঁকুড়ার মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কারখানায়। এই কারখানায় ৩০০০ শ্রমিকের মধ্যে ২৫০০-ই অস্থায়ী। তাদের না আছে ন্যায্য মজুরি, না আছে অন্যান্য আইনসম্মত প্রাপ্যগুলি পাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু আছে ছাঁটাইয়ের নোটিশ, আছে কাজের বাড়তি বোঝা। শ্রম আইন রয়েছে আইনের বইয়েই, বাস্তবে তার প্রয়োগ নেই। এই অবস্থায় শ্রমিকরা লক্ষ করেছেন, শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে একমাত্র অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন চালাচ্ছে। এই সংগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানকার শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নেন, এই সংগঠনের শাখা সংগঠন গড়ে তোলার। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ডিভিসি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন - মেজিয়া ইউনিট গড়ে তোলেন।

২২ আগস্ট প্ল্যান্টের ১নং গেটের কাছে ইউনিয়নের কার্যালয় উদ্বোধন করেন শতাধিক শ্রমিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিট সভাপতি কমরেড জয়দেব পাল। প্রধান বক্তা অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমিকদের নিজস্ব অধিকার আদায় করার জন্য সঠিক নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। তিনি বলেন, যে শ্রমিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা তৈরি করে, তাদের ঘরে কেন অন্ধকার শ্রমিকদের তা বুঝতে হবে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন উক্ত সংগঠনের কর্মকর্তা কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আলোচনা সভা

ব্যাঙ্ক শিল্পে ৯ দফা দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম। সমস্ত পার্টটাইম সাফাই কর্মীদের ফুলটাইম কর্মীতে রূপান্তর, ক্যাজুয়াল ও ক্যান্টিন কর্মীদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ, চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের স্থায়ীকরণ, গ্রাহক পরিষেবাকে উন্নত করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ, সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে বর্তমান পেনশন স্কিমে আনার সুযোগ প্রদান প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৪ আগস্ট ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল ইউকো ব্যাঙ্কের খড়্গপুর শাখায়। প্রধান বক্তা ফোরামের রাজ্য সভাপতি অরূপ সাহা বলেন, ১৯৬৬ সালে প্রথম দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পর ৪২ বছর কেটে গেলেও প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলি আজও পার্টটাইম কর্মীদের ফুলটাইম করার ব্যাপারে কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। এ-বারের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রাক্কালেও তেমন কোন পদক্ষেপ গৃহীত হবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ চাইলেই পার্টটাইম কর্মীদের ফুলটাইম করতে পারে। অথচ কিছু ব্যাঙ্ক সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিলেও পিএনবি, ইউবিআই, ইউকো ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক সহ বেশিরভাগ ব্যাঙ্কে কর্তৃপক্ষ পার্টটাইম কর্মীদের ফুলটাইম করেনি। ফোরাম এ ব্যাপারে দেড় বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মচারীদের সজাগ এবং ঐক্যবদ্ধ করছে। এই দাবিতে গত বছর ১৭ জুলাই দিল্লিতে ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফাই কর্মচারীর চেয়ারপার্সনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং ২৭ জুলাই পার্লামেন্ট অভিযানের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি পেশ করা হয়। আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ফোরামের রাজ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস, সহ-সম্পাদক বসন্ত রায়, মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কেশব দাস, রথীন্দ্রনাথ সিং (পি এন বি), প্রভাত বারিক (ইউকো ব্যাঙ্ক), ননীগোপাল বিশ্বাস (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক)। পার্টটাইম কর্মীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রঞ্জিত কুমার দাস, মহেন্দ্রনাথ সিং প্রমুখ।

বাঁকুড়া

দেবযানী হত্যার প্রতিবাদে জেলা জুড়ে ছাত্র ধর্মঘট

বাঁকুড়া জেলা এস এফ আই-এর সহ-সভাপতি দেবযানী নন্দীর হত্যাকারী হিসাবে অভিযুক্ত ঐ সংগঠনেরই জেলা সম্পাদক অর্ক পোদ্দারকে ঘটনার ১৫ দিন পরেও গ্রেপ্তার না করার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও এবং টিএমসি'র যুক্ত আহ্বানে ২১ আগস্ট জেলা জুড়ে ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। এর আগে হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের দাবিতে এস পি-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং বিক্ষোভ-পথসভা করা হয়। ধর্মঘটের আগের দিন প্রচারের সময় খাতড়ার নিকট সুপুরে সিপিএমের হামলাবাহিনী প্রচারগাড়িতে আক্রমণ চালায় এবং ডি এস ও-র জেলা কোষাধ্যক্ষ অচিন্ত্য মণ্ডল সহ উভয় সংগঠনের বেশ কয়েকজন আহত হয়। ধর্মঘটের দিন এস এফ আই জোর করে, ভয় দেখিয়ে স্কুলে-কলেজে ছাত্রদের ঢোকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ, সারদামণি কলেজ, শালডিহা কলেজ, বেলিয়াতোড় কলেজ, ইন্দাস কলেজ সহ অধিকাংশ স্কুল-কলেজে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট হয়। ঐদিন এস এফ আই-এর হামলায় শালডিহা কলেজে চারজন ডিএসও কর্মীসহ অনেকেই আহত হয়। ইন্দাস, বেলিয়াতোড়, অমর-কানন কলেজেও হামলা চলে। প্রসঙ্গত দেবযানীর বাবা এ সংক্রান্ত মামলাটিকে আসান-সোলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করেন এবং সিপিএম কেন অর্কর বিষয়ে অনুসন্ধান করছে না, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

হাওড়া জেলার বিশিষ্ট পার্টিকর্মী বাগনান লোকাল কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড মুকুন্দ দুয়া ১৭ আগস্ট ভোর রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। ৯০-এর দশকের গোড়াতে তিনি মহান নেতা বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও এস ইউ সি আই দলের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ দলের সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হন। তিনি ছিলেন মৃদু ও স্বল্পভাষী এবং এককথায় নীরব কর্মী। তাঁর মিষ্ট ব্যবহার, নিষ্ঠা, দায়িত্বজ্ঞান ও সর্বোপরি দলের প্রতি আনুগত্য তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করেছে। দলের কাজ ছাড়াও এলাকার ক্লাব, ফ্রি-কোচিং সেন্টার ও কাজি ভুঞেড়া গ্রামে শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে এবং বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার কাজে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সাম্প্রতিককালে কাঁটাপুকুর থেকে বাগনান পর্যন্ত ৫ কিমি দীর্ঘ রাস্তা সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের আন্দোলনে কমরেড দুয়া ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। এই সফল আন্দোলন কমরেড মুকুন্দ দুয়াকে এতদঞ্চলে অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলে। যে রাত্রে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়, সেদিন সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বাগনান ২নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার জলনিকাশি সমস্যা ও খাল সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং রাস্তা সংস্কারের কাজ ত্বরান্বিত করার কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

তাঁর আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ শোনার পর আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম ও অঞ্চল থেকে দলমত নির্বিশেষে বহু শোকাহত মানুষ কাজি ভুঞেড়া গ্রামে তাঁর বাসভবনে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমবেত হন। যে ফ্যাক্টরিতে তিনি কর্মরত ছিলেন সেখানকার কর্মী ও পরিচালকবৃন্দ আসেন। ছুটে আসেন জেলা নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রান্তের দলের কর্মীরা। দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও এলাকার বহু মানুষ অশ্রুসজল নেত্রে তাঁদের প্রিয় সাথীকে শেষ বিদায় জানান। কমরেড দুয়ার বাসভবনের নিকটেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২১ আগস্ট দলের হাওড়া জেলা কমিটির বর্ধিত সভায় কমরেড মুকুন্দ দুয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে দল ও এলাকার জনসাধারণ একজন নিষ্ঠাবান সংগ্রামী সাথীকে হারালো।

কমরেড মুকুন্দ দুয়া লাল সেলাম

গোসাবায় খেয়াযাত্রী কমিটির জয়

গোসাবায় খেয়াঘাটগুলির অব্যবস্থা দূর করতে খেয়াযাত্রী কমিটি লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। জুলাই মাসে বিডিও'র কাছে গণডেপুটেশন দেওয়ার পরদিন থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভাড়া বয়কট শুরু করে। গোসাবার সাতজেলিয়া নটবর হাইস্কুলের ২০০ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী যারা রাঙাবেলিয়া ও মোল্লাখালি পার থেকে নদী পার হয়ে স্কুলে যাতায়াত করে, তারা মিছিল করে এসে খেয়ানৌকায় উঠে নদীপার হয়ে আবার মিছিল করে ভাড়া বয়কট করে স্কুলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী কমিটি স্পেশাল খেয়ানৌকা বন্ধের দাবিতে ত্রিমণির তিন পারে বিক্ষোভ-সমাবেশ শুরু করে। তিন পারে শত শত কৌতূহলী মানুষ ভিড় করেন। সাতজেলিয়া পারে সভা চলতে থাকে। অবশেষে স্পেশাল নৌকা বন্ধ হয়। চাপে পড়ে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ঘাটমালিক। রাত ৮-৩০টা পর্যন্ত খেয়া চালু রাখা ও ছাত্রদের বিনা পয়সায় পারাপারের দাবি মেনে নেন তিনি। আগে গোসাবা ও শম্ভুনগরে ছাত্রছাত্রীদের বিনা ভাড়ায় খেয়া পারাপারের দাবি আদায় কার্যকরী হয়েছে। সাতজেলিয়ার খেয়াযাত্রী আন্দোলনের জয়ের খবর ১৪টি অঞ্চলের সমস্ত খেয়াঘাটে প্রভাব ফেলেছে ও সর্বত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে।

এ আই ডি ওয়াই ও'র
ষষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলা যুব সম্মেলন

২৪ আগস্ট ডোমকল বালিকা বিদ্যাপীঠে প্রবল-উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ আই ডি ওয়াই ও'র মুর্শিদাবাদ জেলা যুব সম্মেলন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্যানার, ফেস্টুনে সুসজ্জিত একটি দৃপ্ত যুবমিছিল ডোমকল শহর পরিক্রমা করে, যা দেখে সাধারণ মানুষ অভিভূত হন।

মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব ছাড়াও, জেলায় শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন ও বেকারদের কর্মসংস্থান, অপসংস্কৃতি-অশ্লীল সিডি-সিনেমা-বিজ্ঞাপন বন্ধ করা, নারী ও শিশুপাচার রোধ করা এবং সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড গোলাম আম্বিয়ার উপর সাম্প্রতিক পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ সহ অন্যান্য দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ। তিনি যুবজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলনের আহ্বান জানান। সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী। কমরেড ব্যানার্জী এযুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কীভাবে যথার্থ যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও গড়ে উঠেছে, সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমাদের মূল্যবোধ-বিবেক-মনুষ্যত্ববোধ জাগানোর মধ্য দিয়ে প্রকৃত যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড সামসুল আলম। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড কৌশিক চ্যাটার্জী। সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড গোলাম আম্বিয়াকে সভাপতি ও কমরেড অনুপ সিন্‌হাকে সম্পাদক করে ২০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সারা বাংলার পরিচারিকারা কলকাতায় আসছেন তাঁদের যন্ত্রণা ও ক্ষোভ জানাতে

ওরা অন্যের ঘর মুছে বসবাসের উপযুক্ত করে তোলে, জামা-কাপড় পরিষ্কার করে দেয়, রান্না করে, বাসন মাজে। বিনিময়ে পায় নামমাত্র মজুরি। আর, পান থেকে চুন খসলে ওদের কপালে জোটে অপমান, লাঞ্ছনা, আর কাজ কেড়ে নেওয়ার হুমকি। ওরা গৃহ-পরিচারিকা, চলতি কথায় 'ঝি'।

ওদের কারও স্বামী অসুস্থ, রোগশয্যায়; কেউ বা স্বামী পরিত্যক্তা। ওদের ঘাড়ে সন্তানদের দায়িত্ব ফেলে দিয়ে বীরপুঙ্গব স্বামীরা আর একটা বিয়ে করে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠেছে; কারও বা স্বামী মদ্যপ-লম্পট। ঘরে খাবার নেই। বাধ্য হয়ে সন্তানদের মুখে, পরিবারের অন্যদের মুখে খাবার তুলে দিতে, অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে ওরা ঘর ছেড়ে পথে নামে, ছোটে অন্যের বাড়ি কাজ করতে।

দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমানের দূর দূর গ্রাম থেকে রেলস্টেশনে এদের আসতে হয়। প্রতিদিন নতুন নতুন চাষের জমি হারিয়ে, চাষের সুযোগ না পেয়ে, কল-কারখানা যতটুকু চলছিল তাও একটার পর একটা বন্ধ হওয়ায় ঘরে ঘরে পুরুষরা কাজ হারিয়ে বেকার। ফলে সংসার অচল, সকলে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। তাই মহিলারা ছুটছে কাজের সন্ধানে। বাধ্য হচ্ছে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে। মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে হচ্ছে শহরের খালের ধারে, জলাভূমি বা রাস্তার ধারে ঝুপড়িতে। মহিলারা খুঁজে নিচ্ছেন পরিচারিকার কাজ। আর পুরুষরা কেউ ভ্যান-রিক্সা টানা বা দিন মজুরির কাজ করছেন, কেউ তাও পাচ্ছেন না। প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে বেকার অর্ধবেকারের সংখ্যা, পরিচারিকাদের কাজেরও নিশ্চয়তা থাকছে না। কমছে মজুরিও।

রাত আড়াইটে-তিনটেয় বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ঘুমন্ত বাচ্চাকে হয়তো আলতো করে একটু আদর করে নেয়, যেন জেগে না যায়। সারাদিনের মধ্যে আর তো দেখা হবে না। গোটা গ্রাম তখন ঘুমের ঘোরে, ওরা চলে স্টেশনের দিকে। দেড়-দু'ঘন্টা হাঁটা। ভোর চারটে বা সাড়ে চারটের গাড়ি। ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে ঢুলতে ঢুলতে ওরা হাজারে হাজারে চলে কলকাতায়, হাওড়ায়। চারটে থেকে ছ'টার ট্রেনকে লোকে বলে 'ঝি স্পেশাল', মানে 'ঝিয়ের গাড়ি'। এতেও এল বাধা। একদিন এই ঝিয়ের গাড়িতে চড়ে মা-বোনেরা নিশ্চিন্তে শহরে আসতে পারতেন, টিকিট কাটার কথা না তারা ভাবতেন, না ভাবত রেলকর্তৃপক্ষ। হঠাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসন গরিব মানুষের এই 'বেআইনি' যাতায়াতের বিষয়ে সতর্ক হল, ভীষণ কড়া হয়ে উঠল। প্রথমে শুরু হল মাসিক ১৫ টাকা হারে স্বল্পমূল্যের টিকিটের ব্যবস্থা ; সেই টিকিট হাতে পাওয়া নিয়েও মর্মান্তিক হয়রানি। কিছুকাল পরে ১৫ টাকার মাস্থলিও বন্ধ করে দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ শুরু করল 'বিনা টিকিটধারী' মা-বোনদের ধরপাকড়, অপমান, জরিমানা, লাঞ্ছনা, হয়রানি। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে তাঁরা গড়ে তুললেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি। সমিতির লাগাতার আন্দোলনে স্বল্পমূল্যের (২৫ টাকার) মাসিক টিকিটের দাবি নানা শর্ত-সাপেক্ষে স্বীকৃতি পেলেও এখনও বহু আমলা এই সামান্য সুযোগটুকুও দিতে নারাজ। নানা অজুহাত দেখিয়ে বঞ্চিত করছে এদের। মাশুল গুনতে হচ্ছে পরিচারিকা মা-বোনেদের। সম্প্রতি চলন্ত টিকিট পরীক্ষার ট্রেন 'চেতনা' থেকে এক পরিচারিকাকে ঘুটিয়ারি শরিফে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হত্যা করা হয়।

যে স্বপ্ন-সুখ বুকে নিয়ে ওরা ঢুকেছিল সংসারজীবনে, সেখানে আজ চরম হতাশা, যন্ত্রণা। মদ্যপ-লম্পট স্বামীর অত্যাচার, বঞ্চনা, সাংসারিক অভাব-অনটনের যন্ত্রণা, অনাহারক্লিষ্ট সন্তানের কান্না, ভেঙেপড়া শরীর, এবং সেই সঙ্গে একশ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের ইতরজনোচিত আচরণ — এই-ই ওদের জীবনসঙ্গী। অন্যায় ও কুরুচিকর নানা আব্দারও বহুক্ষেত্রেই ওদের কাউকে কাউকে মেটাতে হয়। না হলে কাজ চলে যাবে; পাওনা টাকা না দিয়ে উল্টে চুরির অভিযোগ ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে। এসবকিছুই ওদের করে তুলেছে রূঢ়-রুক্ষ। যে কোনও মূল্যে সন্তানদের নিয়ে সংসারে টিকে থাকার অসহনীয় জীবনযুদ্ধে আজ ওরা বেপরোয়া। কিন্তু, ওরা তো এমনটা ছিল না। কেন ওরা এমন হয়ে গিয়েছে, তার খোঁজ আমরা ক'জন রাখি! ওদের বুকের মধ্যে জমাট বাঁধা বেদনার কোনও সংবাদ আমরা রাখি না। মায়ের বুকের দুধ খাওয়া যে শিশুটা মাকে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই শিশুর জন্য পরিচারিকা মায়ের বুকে যে বেদনার ঝড় ওঠে, তা ওদের মুখ ফুটে বেরোয় না। ওরা যখন কাজের বাড়ির সন্তানকে ভাল খাবার নিজের হাতে তুলে আদর করে খাওয়ায়, তখন তার নিজের বুকের ভিতরটা বাড়িতে ফেলে আসা নিজের সন্তানের জন্য কাতর হয়ে উঠে। অবশ্য সকল কাজের বাড়িতেই যে অপমান-লাঞ্ছনা হয়, তা নয়, কোথাও কোথাও যত্ন আদরও তারা পায়।

সারাদিন এবেলা ওবেলা কাজ সেরে ওরা বিকালের ট্রেনে রওনা হয় নিজেদের বাড়ির উদ্দেশে। বাড়ি ফেরে সন্ধ্যায়, বা তার কিছু আগে-পরে। তারপর বাড়ির কাজকর্ম, রান্না সেরে খাওয়া-দাওয়া। সেই সঙ্গে কারও বা জোটে মদ্যপ-লম্পট স্বামীর অত্যাচার। তারপর বিছানায় এলিয়ে দেয় ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরটাকে, তাও কয়েক ঘন্টার জন্য। আবার রাত আড়াইটে বাজলেই বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে।

ক' বছর আগেও ওরা অসংগঠিত ছিল। ওদের কোনও সংগঠন ছিল না। বেদনা-যন্ত্রণার কথা ওদের বুকের মধ্যেই গুমরে গুমরে থেমে যেত। প্রকাশের জায়গা পেত না। ওদের নির্দিষ্ট বেতন বলে আজও কিছু নেই। সপ্তাহে একটা দিনও ওদের ছুটি মেলে না। শরীর খারাপ হলেও রেহাই নেই। কামাই হলে অপমান-লাঞ্ছনা, কাজ চলে যাবার ভয়। অধিকাংশেরই বিপিএল তালিকায় নাম নেই। কাজ করার শক্তি যেদিন ওদের শরীরে আর থাকবে না, সেদিন চলবে কেমন করে, তার কোনও উত্তর ওদের জানা নেই। সন্তানদের পড়াশুনো চলবে কী করে, টাকা কোথায় পাবে — কেউ জানে না। অন্যের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে যে অপমান, লাঞ্ছনা ও শারীরিক-মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়, কাউকে বা খুন করে আত্মহত্যা বলে প্রচার করে দেওয়া হয় — এ সবের প্রতিকার কোথায়, তাও ওরা এতকাল জানতো না। এই অসহায় অসংগঠিত এবং সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে 'সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি'। হাজার হাজার পরিচারিকা এই সমিতির সদস্য হয়েছেন। কিন্তু সরকার ওদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে না, সমিতির রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না। ওরা দাবি করেছে — শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি চাই, পরিচয়পত্র চাই, ন্যূনতম বেতন চাই, সপ্তাহে একদিনের ছুটি চাই, বিপিএল তালিকায় পরিচারিকাদের নাম চাই, বৃদ্ধ বয়সে ভাতা চাই, সন্তানদের পড়াশুনোর আর্থিক খরচ সরকারকে বহন করতে হবে; আর চাই সামাজিক নিরাপত্তা। এইসব দাবির ভিত্তিতে সমিতির নেতৃত্বে পরিচারিকারা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করবে, বিধানসভা অভিযান করবে, শ্রমমন্ত্রীর কাছে জানাবে নিজেদের জীবন-জীবিকার দাবি।

পরিচারিকাদের সমাবেশ ও শ্রমমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন

১০ সেপ্টেম্বর, মেট্রো চ্যানেল

'৫৯ সালের খাদ্যআন্দোলনের ও '৯০ সালের ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের শহীদ স্মরণে

রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের শহিদবেদিতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। (ডানদিকে) রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে কমরেড মাধাই হালদার শহিদবেদিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী।

কাটোয়ায় সর্বদলীয় বৈঠকে জমি দখলের হীন প্রচেষ্টা

কৃষিজমি ধ্বংস করে কাটোয়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে 'কৃষিজমি, কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটি' শুরু থেকেই আন্দোলন করে যাচ্ছে। অথচ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে এই কমিটিকে একবারও ডাকা হচ্ছে না। ডাকা হচ্ছে না সেই আন্দোলনের অন্যতম শরিক এস ইউ সি আইকেও। গত ২৭ আগস্ট কাটোয়া মহকুমা দপ্তরে যে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয় এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেস তা বয়কট করে। সরকার সর্বদলীয় বৈঠকে কেন এদেরকে ডাকছে না? তবে কি কোনও গোপন উদ্দেশ্য আছে?

কাটোয়ায় যারা আন্দোলন করছে তারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধী নয়। তাদের বক্তব্য, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাটোয়ার পরিবর্তে কোলিয়ারি অঞ্চলে হোক। সেখানে করাটা সমস্ত দিক দিয়েই সুবিধাজনক। কিন্তু সরকারের জেদ কাটোয়াতেই করতে হবে। ফলে কৃষকরা জীবনজীবিকা রক্ষায় আন্দোলনে নেমেছে। ২৭ আগস্ট সর্বদলীয় বৈঠকে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি পি ডি সি এল কর্তৃপক্ষকে কথা দিয়েছে, চাষিদের রাজি করিয়ে জমি পাওয়ার ব্যবস্থা তারা করে দেবে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকরা এ সংবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে ঐদিন দুই শতাধিক কৃষক ও খেতমজুরদের সঙ্গে নিয়ে এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এসডিও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ সমাবেশে এস ইউ সি আই-র পক্ষে অশোক দাঁ, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে মণ্ডল আজিজুল এবং কৃষক ও খেতমজুরদের পক্ষ থেকে কালিচরণ সর্দার বক্তব্য রাখেন। এসডিও-র কাছে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন মোঃ জাকারিয়া, মণ্ডল আজিজুল, দিপুল ঘোষ, নিতাই সাহা ও হবিবুল্লা সেখ।

কোচবিহার

বিদ্যুতায়নের দাবিতে মহিষকুচিতে কনভেনশন

তুফানগঞ্জ মহকুমার ২নং মহিষকুচি অঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। এই অঞ্চলে বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির (অ্যাবেকা) স্থানীয় বাকলা শাখা। তাদেরই উদ্যোগে অঞ্চলের ১৫টি বুথে 'বিদ্যুৎ চাই সংগ্রাম কমিটি' গড়ে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবার বাকলা গ্রাম-পঞ্চায়েতে অ্যাবেকার একজন সদস্য গৌরাঙ্গ মোদক প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

১৭ আগস্ট অ্যাবেকার পক্ষ থেকে বাকলা রামকৃষ্ণ হাইস্কুল মাঠে বিদ্যুৎহীন গ্রামে অবিলম্বে বিদ্যুতায়নের দাবিতে, ভয়াবহ লোডশেডিং ও বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন অ্যাবেকার কোচবিহার জেলা সভাপতি সমীর গুহ মজুমদার। তিনি বলেন, ২০০৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকার। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। এখন বলা হচ্ছে, ২০১১ সালের মধ্যে নাকি ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা হবে। তিনি বলেন, আধুনিক সভ্যতা বিদ্যুৎ ছাড়া অচল। অথচ এরাজ্যের প্রায় বেশিরভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ নেই।

রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ, অ্যাবেকার তুফানগঞ্জ কমিটির উপদেষ্টা দেবেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, কোনও গ্রামের ধার দিয়ে মেইন লাইনের তার চলে গেছে বা একটা খুঁটি পোঁতা রয়েছে — তাই দেখিয়ে ঢক্কানিনাদে প্রচার করা হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। এবার যে বিদ্যুতায়নের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে তাতে গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার কোচবিহার জেলা সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী, ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পুষ্পিতা ডাকুয়া, মহিষকুচি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চিত্তরঞ্জন সরকার, অ্যাবেকার মহকুমা সভাপতি নিরঞ্জন দাস, সম্পাদক ভোলা সাহা, অ্যাবেকার সদস্য তথা বাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য গৌরাঙ্গ মোদক প্রমুখ।

এত উন্নয়ন! তাহলে ভারত দারিদ্রে তৃতীয় কেন?

দেশ যখন 'উন্নয়নের' বুকনিতে ভাসছে, রাজ্যে সিপিএম নেতাদের বাণীতে শিল্পায়নের খই ফুটছে, তখনই বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ হতদরিদ্র মানুষের বাস এই ভারতবর্ষে। ক্রয়ক্ষমতাভিত্তিক হিসাবে আন্তর্জাতিক দারিদ্রসীমা দৈনিক ১.২৫ ডলার (৫৫ টাকার মতো)। এর কম ব্যয়ক্ষমতার মানুষের সংখ্যা ভারতে ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২ শতাংশ। এই হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে দারিদ্রসীমার নিচে রয়েছে ১৪০ কোটি মানুষ, তার এক-তৃতীয়াংশই রয়েছে এই 'উন্নয়নশীল' ও 'শিল্পায়ন'-এর স্বর্গরাজ্যে।

তাহলে যাঁরা দারিদ্রসীমার উপরে, তাঁরা কেমন আছেন? দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাঙ্ক নির্ধারিত দারিদ্রসীমার এক চুল উপরে রয়েছে আরও ৩৭ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। তাহলে বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাবে দৈনিক ২ ডলার (প্রায় ৮৬ টাকা)-এর কম খরচ করতে পারে এমন মানুষের মোট সংখ্যা ভারতে প্রায় ৮২ কোটি ৮০ লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৭৫.৬ শতাংশ।

আমেরিকা বা পশ্চিমী দেশের তুলনায় এদেশে জিনিসপত্রের দাম কম, তাই এদেশে কম আয়েও তুলনায় ভাল থাকা যায় — এই অজুহাতও এক্ষেত্রে অচল। কারণ বিশ্বব্যাঙ্কের এই হিসাব কষা হয়েছে ক্রয়ক্ষমতাকে ভিত্তি করে। মানে, জীবনধারণের জন্য যেটুকু না হলেই নয়, ততটুকু জিনিস কিনতে কোন দেশে কত টাকা খরচ করা দরকার — সেটা কষে বের করে বিশ্বব্যাঙ্ক দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করেছে। এই হিসাবে ভারতের দারিদ্রসীমার উপরে থাকেন তারা যাদের দৈনিক ব্যয় ৫৫ টাকার বেশি। উন্নত দেশে এটা আরও বেশি হবে। এই যদি ৭৫ ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হয়, তাহলে 'শিল্পায়ন' হবে কী করে? আর কত মানুষই বা টাটার একলাখি ন্যানো গাড়ি কিনবে?

পুঁজিবাদী শোষণ দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে এখানে টেনে নামিয়েছে, যেটাই আজ শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা। পুঁজি নেই, জমি জুটছে না, সরকারি করভার বেশি, বা আন্দোলন ঘেরাও হচ্ছে বলে শিল্পায়ন হচ্ছে না — এটা নেহাতই মিথ্যা প্রচার। বণিকসভার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ কালরা বলেছেন — "ভারি শিল্পে মন্দার প্রধান কারণ চাহিদার অভাব।" লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সংবাদপত্রে বাণিজ্যজগতের খবরাখবরের পাতায় শিল্পপতিরা বলছেন — চাহিদার অভাবই শিল্পে মন্দা ডেকে আনছে। আবার সেই শিল্পপতিরাই সাধারণ বিবৃতিতে বলছেন — বন্ধ, আন্দোলন ইত্যাদির জন্য শিল্প বাধা পাচ্ছে। গত বছর, অর্থাৎ ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে কারখানা বন্ধ হয়েছে মাত্র ১২টি, আর মালিকরা লকআউট করেছে ২৬০টি। আন্দোলনের জন্য ১ কোটি ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে, আর ২ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে লকআউটে (সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ২৭.৮.০৮)।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের রিপোর্টে প্রকাশ যে, শিল্পোন্নয়নের হার ২০০৬-০৭ সালের ১১ শতাংশ থেকে নেমে ২০০৮-০৯ সালে ৭.৫ শতাংশ হবে। বহুপ্রশংসিত উদীয়মান পরিষেবা শিল্পের প্রবৃদ্ধি ১১.১ শতাংশ থেকে কমে ৯.৬ শতাংশ হবে।

সরকারি তথ্যই দেখাচ্ছে, শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না। তাহলে সিঙ্গুরে কারখানা হচ্ছে কী করে? শিল্পবিকাশ হচ্ছে না কথার মানে একটাও কারখানা হবে না, এমন নয়। একটা নতুন কারখানা হলে দশটার নাভিশ্বাস উঠবে। একলাখি ন্যানো কারা কিনবে? যারা দু'চাকার মোটর বাইক কিনছে ৫০ হাজারে, তারা যদি ন্যানো কেনে তবে সামগ্রিকভাবে দু'চাকার যান বিক্রি কমতে বাধ্য। কম দামী যে-ক'টা গাড়ি আছে, তাদের বাজারেই ভাগ বসাবে ন্যানো। মালিকরা আধুনিক যন্ত্র বসিয়ে, লোক কমিয়ে মজুরি খরচ কমাবে, ইস্পাতের জায়গায় সিন্থেটিক ব্যবহার করে খরচ কমিয়ে লাভ বাড়াবে। এরই নাম পুঁজিবাদের আওতায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'দক্ষতা' বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের এই সংকটের কথা বলে গিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি দেখিয়েছেন, আমরা কমিউনিস্টরা শিল্পবিরোধী নই; আধুনিক প্রযুক্তিরও বিরোধী নই। শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা হল বাজারের অভাব — জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অভাব, যার মূলে আছে পুঁজিবাদ। আজকের পুঁজিবাদ মুমূর্ষু, তাই শিল্পায়ন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আজ যারা শিল্পায়ন চায়, তাদের পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামে নামতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে বর্তমান শিল্পায়নের প্রবক্তা কংগ্রেস-বিজেপি বা সিপিএম মুমূর্ষু পুঁজিবাদের আওতায় 'শিল্পায়ন' করার ধোঁকা দিচ্ছে। তাই তাদের শিল্পায়নের বাস্তব মানে দাঁড়িয়েছে, আরও একচেটিয়াকরণ, কর্মসঙ্কোচন এবং করছাড়, শুল্কছাড় দিয়ে মালিকদের মুনাফার থলি ভরানো। তাই দেখা যাচ্ছে মালিকশ্রেণী এই শিল্পায়নের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বিশ্বপুঁজিবাদের গোড়ায় প্রকৃত শিল্পায়নের যুগে মালিকরা তাদের মুনাফার স্বার্থেই শ্রমিকের মজুরি বাড়িয়েছে। ধর্মঘটের অধিকারকে মেনে নিয়েছে। টাটা প্রসঙ্গে যার তুলনা বার বার আসছে সেই হেনরি ফোর্ডকে টাটার মতো প্রকাশ্যে আন্দোলনের বিরোধিতা করতে হয়নি, সরকারি দাক্ষিণ্য প্রত্যাশী হয়ে মার্কিন সরকারের সাহায্য চাইতে হয়নি। আজ টাটাকে সরাসরি আন্দোলনের বিরোধিতায় নামতে হচ্ছে, কারণ তাঁর পলিটিক্যাল ম্যানেজার সিপিএম বিক্ষুব্ধ জনতাকে সামলাতে পারছে না। জলেও নামব, চুলও ভেজাব না — এই চালাকির পরিসর আজ আর সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের আওতায় নেই। তাই টাটা আর বুদ্ধদেববাবু একই সুরে শ্রমিকবিরোধী, জনস্বার্থবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী হুমকি দিচ্ছেন। জনদরদের মুখোশ খসে বেরিয়ে পড়ছে তাদের জনবিরোধী বীভৎস মুখ।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি নিয়ে

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রতারণামূলক

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রচারের তীব্র বিরুদ্ধতা করে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ১৫ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাবৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দামামা বাজিয়ে আসলে কর্মচারীদের প্রতি প্রতারণাকেই আড়াল করতে চান।

উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতি প্রয়োগ করে সরকার সামগ্রিকভাবে কর্মচারীর সংখ্যা কমাচ্ছে। বিশেষ করে রেলে ও সরকারি দপ্তরে প্রায় ১০ লক্ষ 'গ্রুপ ডি' কর্মচারীর পদই বিলোপ করে দিয়েছে। এদের মধ্যে যাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ডিগ্রি আছে, তাদের এবং অন্যদের কিছুজনকে ট্রেনিং-এর মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করিয়ে 'গ্রুপ সি' পদে প্রমোশন দেবে সরকার। কিন্তু বাকি অধিকাংশ গ্রুপ ডি কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকার নীরব। এদের 'বাতিল' ঘোষণা করে অকালে রিটায়ার করিয়ে দেওয়া হবে। বিস্ময়ের কিছু থাকবে না যদি দেখা যায়, বাতিল কর্মচারীদের কাজগুলি এরপর আউটসোর্স করে বাইরে থেকে ঠিকা কর্মচারীদের দিয়ে করিয়ে আনা হচ্ছে। এদের সামান্য মজুরি দিয়ে, চাকরির নিরাপত্তা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াই নির্ধারিত সময়ের বেশি ঘণ্টা কাজ করানো হবে, যেটা এখনই সিপিডব্লুডিতে করানো হয়ে থাকে।

কমরেড সাহা আরও বলেন, কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণের প্রশ্নে সরকার পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের (১৯৫৭) সর্বসম্মত সুপারিশ, যাকে সুপ্রিম কোর্ট আরও উন্নত করেছিল, তা অনুসরণ করেনি। শুধু তাই নয়, চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশে যেখানে ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ আয়ের মধ্যে ১ঃ৮ আনুপাতিক ব্যবধান ছিল, সেখানে ষষ্ঠ বেতন কমিশন এই ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে ১ঃ১৬ করেছে। এটা আরও বাড়বে, যখন আগামী ১০ বছরে ডিএ বাবদ আয় বিভিন্ন হারে মূল আয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে।

এবার সরকার কর্মচারীদের গেজেটেড মোট ছুটি থেকে ১৩ দিন কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে রেসট্রিকটেড ছুটির পরিমাণ ৬ দিন বাড়িয়েছে। এর দ্বারা আসলে ৭ দিন ছুটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা দরকার যে, সার্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়েই গেজেটেড ছুটির সংখ্যা স্থির হয়েছিল। কিন্তু এই সরকার, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় ছুটি পাওয়ার অধিকার থেকেই কর্মচারীদের বঞ্চিত করছে।

কাজের ভিত্তিতে ইনসেনটিভ দেওয়ার যে স্কিম সরকার নিয়েছে, তা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে একদল 'জো-হুজুর' কর্মচারী তৈরির জন্যই। এই স্কিমে বোনাসের অধিকারকেও খর্ব করা হচ্ছে। কাজের উপর নির্ভর করে নানা হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থাকে আমলারা যেমন খুশি কাজে লাগাবে অধস্তন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। বর্তমানে কর্মচারীদের জন্য সিজিএইচএস-এর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য যেসব মেডিকেল সুযোগ-সুবিধা আছে, তার পরিবর্তে মেডিকেল বিমা চালুর নির্দেশও কর্মচারী স্বার্থের পরিপন্থী পদক্ষেপ।

কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ১০ হাজার টাকা করা হচ্ছে বলে সরকারি ঘোষণা আদতেই প্রতারণা। কারণ, গ্রুপ ডি কর্মচারী পদ বিলোপ করে দেওয়ার পর গ্রুপ সি-দের দিয়েই কর্মচারীপদ শুরু হবে এবং গ্রুপ সি কর্মচারীরা ইতিপূর্বেই ১০ হাজার টাকার বেশি ন্যূনতম বেতন পাচ্ছেন।

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার তারিখ ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি রাখা হলেও ভাতা ইত্যাদি কার্যকর করার তারিখ ২০০৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর করা হয়েছে, যা কর্মচারীদের প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচার।

কমরেড সাহা বেতন কমিশনের এইসব নেতিবাচক সুপারিশগুলি চালু করার পিছনে সরকারি মতলবকে বুঝে নিয়ে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলে এগুলি বাতিল করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করার জন্য সাধারণ কর্মচারীদের আহ্বান জানান।

উত্তর ২৪ পরগণা

জবকার্ডধারী গ্রামীণ মজুর ইউনিয়নের পঞ্চায়েত ঘেরাও

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন অনুযায়ী কাজের গ্যারান্টি দূরে থাক অনেকে জবকার্ডই পাননি। যাঁরা জবকার্ড পেয়েছেন তাঁদের অনেকেই কাজ পাননি। গ্রামীণ মজুরদের কমপক্ষে বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার অথবা আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে না পারলে বেকারভাতা দেওয়ার আইনি গ্যারান্টি থাকলেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। অথচ দু-বছরের বেশি হল এই গ্যারান্টি আইনটি তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলি এই আইন সঠিকভাবে রূপায়ণ না করায় ইতিমধ্যে প্রতিটি গ্রামীণ মজুর পরিবার দৈনিক ৭০ টাকা মজুরি হিসাবে বছরে ৭০×১০০ = ৭০০০ টাকা অর্থাৎ গত ২ বছরে প্রায় ১৪,০০০ টাকা করে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আবার যাঁরা যতটুকু কাজও পেয়েছেন তাঁদের টাকাও ঠিকমত দেওয়া হয়নি। মজুরির টাকা নিয়েও মাসের পর মাস হয়রানি করা হচ্ছে। আইন অনুযায়ী দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কখনই তা ১৪ দিনের বেশি দেরি করা যাবে না। জবকার্ডে ভুয়া সই করিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে — এমন উদাহরণও অসংখ্য।

এত সব বঞ্চনা এবং হয়রানির অন্যতম কারণ হল — গ্রামীণ মজুরদের মধ্যে সংগঠনের অভাব। এই অভাব দূর করতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় জবকার্ডধারীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে — 'জবকার্ডধারী গ্রামীণ শ্রমিক ইউনিয়ন'। এই ইউনিয়নের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক শাখা কমিটি।

এই কমিটির উদ্যোগে ১১ আগস্ট পৃথিবা পঞ্চায়েত ঘেরাও করা হয়। ৫টি কমিটি থেকে প্রায় আড়াইশো গ্রামীণ মজুর ১০০ দিনের কাজ সহ ১২ দফা দাবি সংবলিত দাবিপত্র পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে জমা দেন এবং কার্যকর করার দাবি জানান। তা করা না হলে জবকার্ডধারী গ্রামীণ মজুর ইউনিয়ন এলাকা জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং পঞ্চায়েত ঘেরাও, বিক্ষোভ-ডেপুটেশন কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে।

কোচবিহার

মাথাভাঙায় ডিএসও-র আঞ্চলিক সম্মেলন

মাথাভাঙা মহকুমার জোড়পাটকী এলাকায় ১৫ আগস্ট স্কুলস্তরে গ্রেডেশন, যৌনশিক্ষা চালু করা ও ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডি এস ও-র প্রথম বার্ষিক আঞ্চলিক ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণালকান্তি রায়। ২১৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে তাপস বর্মন, অমল দাস এবং সুজিত বর্মন। একই দাবিতে ১০ আগস্ট হাজরাহাট আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ৭৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই মাথাভাঙা লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মির্জা কারিমুল হাসান। মর্তুজা আলমকে সম্পাদক, রাজেশ বর্মনকে সভাপতি ও দ্বিজেন বর্মনকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে আগুয়ান হতে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটির আহ্বান

কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইরাক বা আফগানিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নৃশংস বর্বরতা ও ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। যেসব দেশে তেমন ধ্বংসলীলা তারা চালায়নি, এমনকী সেখানেও মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে শান্তি, সুস্থিতি ও উন্নয়নের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মার্কিন সামরিক হানাদারিতে ইরাকে মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষ ছাড়িয়েছে। ৫০ লক্ষেরও বেশি ইরাকি মানুষ আজ ঘরবাড়ি সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত। মার্কিন দখলীকৃত সারা দেশটাই আজ বাস্তবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

চরম দুর্দশাগ্রস্ত আফগানিস্তানেও মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর দখলদার বাহিনী কিছুমাত্র উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। ন্যাটো বাহিনীর সামরিক আক্রমণের পাল্লা পাকিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় সমগ্র অঞ্চলটিতেই আজ লাগামছাড়াভাবে সামরিকীকরণ শুরু হয়ে গেছে।

এই সমস্ত অঞ্চলেই গণপ্রতিরোধ উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠা প্রয়োজন। কিন্তু পাশাপাশি যেসব অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নীরবে তার থাবা বসিয়ে চলেছে, সেসব অঞ্চলেও তাকে প্রতিরোধের কর্তব্যটি যেন চোখের আড়ালে থেকে না যায়।

যেকোনও দেশের মাটিতে বিদেশি সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতির মানেই হল, সে দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জনের জন্য চাপ। বিদেশি সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি নির্মাণের অর্থ, সেদেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে অনুসৃত বিভিন্ন নীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ দেশে দেশে তাদের সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের মাধ্যমে ঠিক এই কাজই করে চলেছে। এসব ঘাঁটিগুলো কোথাও সরাসরি তাদের নিজেদের সামরিক বাহিনীর নামেই গড়ে তোলা হয়েছে, কোথাও বা পর্দার আড়ালে সেগুলি গড়ে উঠেছে বেসরকারিভাবে। গোপন চুক্তি অনুসারে তাদের গালভরা নাম দেওয়া হচ্ছে, 'কো-অপারেটিভ সিকিউরিটি লোকেশনস', সংক্ষেপে সি এস এল।

সারা পৃথিবীর মোট ৭০টি দেশে এইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জালের মতো তাদের সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। আর মোট ১০০টি দেশে নতুন নতুন সি এস এল গড়ে তোলা হচ্ছে।

আজ সারা দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া জুড়ে এইভাবে জালের মতো মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং সি এস এল ছড়িয়ে রয়েছে। তার উপর পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই ছড়িয়ে আছে ন্যাটোর ঘাঁটি। কলম্বিয়াতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির উপস্থিতি আজ পশ্চিম গোলার্ধের শান্তি ও সুস্থিতির পক্ষে বিপজ্জনক।

যেসব দেশ তাদের নিজেদের দেশের মাটিতে এইসব সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করায় বাধা দিয়েছে, বা আই এম এফ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থা নির্দেশিত পথে না গিয়ে নিজেদের মতো করে উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছে, তাদেরই বিরুদ্ধে নানা ধরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে অর্থনৈতিকভাবে একঘরে করে এবং রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে আক্রমণ শানানো হয়েছে।

অসম এবং বিশ্বায়নী বাণিজ্যের নাগপাশে আবদ্ধ দুনিয়ায় কোনও দেশের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বা অবরোধ মানে হল, পশ্চাদপদতা ও বুভুক্ষার দিকে সে দেশকে ঠেলে দেওয়া। অর্থনৈতিক অবরোধ একটা দেশকে জবরদস্তি অর্থনৈতিকভাবে একঘরে করে দেয়, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়, যার আঘাতটা সবচেয়ে বেশি পড়ে অসহায় দরিদ্রতম মানুষের ওপর, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর। অর্থনৈতিক অবরোধ ডেকে আনে উপবাস, অপুষ্টি, রোগ ও মৃত্যুকে।

কিউবার উপর নজিরবিহীন শত্রুতামূলক মার্কিন নিষেধাজ্ঞা চাপানো রয়েছে ৫০ বছর। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, যা আসলে বকলমে যুদ্ধঘোষণা, তার শিকার হয়েছে সিরিয়া, ইরান, সুদান, সোমালিয়া, জিম্বাবোয়ে, উত্তর কোরিয়া, সার্বিয়া, মায়ানমার সহ আরও অনেক দেশ। মার্কিন আক্রমণের টার্গেট এই দেশগুলির পরিণতির নজির দেখিয়ে, আতঙ্ক সৃষ্টি করে অন্যান্য দেশকে নতিস্বীকারে বাধ্য করার চেষ্টা চলছে।

মার্কিন সামরিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে ও আগ্রাসনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্যালেস্তিনিয় জনগণ ও প্রতিবেশী দেশগুলির উপর ৬০ বছর ধরে ইজরায়েলি হানাদারি ও আগ্রাসনে ইন্ধন জুগিয়েছে মার্কিন সামরিক সাহায্য; যে সাহায্য ছাড়া এই আগ্রাসন সম্ভব ছিল না। অবিলম্বে এ জিনিস বন্ধ হওয়া দরকার।

ওয়াশিংটন দাবি করে যে, মার্কিন টার্গেট এসব দেশের গলা টিপে ধরায় নাকি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সমর্থন আছে। একইভাবে সেসব দেশে অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাত চালাতে অন্যান্য দেশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন, ব্যাঙ্ক ও ঋণদাতা আর্থিক সংস্থাকে চাপ দিচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

এইসব হীন চক্রান্তের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে এর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা এবং স্বাধীন জাতিগুলির সার্বভৌমত্বের উপর এই আঘাত প্রতিরোধে দেশে দেশে জনগণকে সামিল করার কাজে ইতিমধ্যেই কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছে। বিশ্বের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সামনে অবিলম্বে একাজ শুরু করাটাই জরুরি কর্তব্য।

ইতিমধ্যেই পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক থেকে শুরু করে ফিলিপাইনস ও ইকোয়েডর পর্যন্ত, দেশে দেশে পুরনো মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও নতুন ঘাঁটি তৈরির চুক্তির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ ক্রমেই বাড়ছে। পৃথক পৃথকভাবে গড়ে ওঠা এই গণপ্রতিবাদগুলির পিছনে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সংহতি জোগাতে হবে।

আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, পূর্বতন সোভিয়েত রিপাবলিকগুলি ও মধ্য এশিয়ার কোথাও কোনও মার্কিন সামরিক অস্তিত্ব রাখা চলবে না। ইরানের উপর আক্রমণের ক্রমবর্ধমান হুমকি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

আর্থিক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিটি সংগ্রামকেই সমভাবে সমর্থন যোগাতে হবে। আর্থিক নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে একঘরে করে রাখার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সংহতি হল শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

শান্তি, ন্যায় ও সৌভ্রাতৃত্বকে শক্তিশালী করার আন্তর্জাতিক লড়াইকে কি আপনি জোরদার করতে চান?

সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামের পাশে কি আপনি দাঁড়াতে চান?

তাহলে এগিয়ে আসুন। মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শরিক হোন।

—নিবেদক

র‍্যামসে ক্লার্ক - প্রেসিডেন্ট

মানিক মুখার্জী - সাধারণ সম্পাদক

ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস্ সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি

একদা বিতাড়িত ইরাক পেট্রো কোম্পানি ফিরে এল ইরাকে

বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিশ্বশান্তির স্বঘোষিত প্রহরী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ দ্বিতীয় দফায় ইরাক আক্রমণের প্রাক্কালে প্রচার করেছিলেন, সাদ্দাম হুসেন ইরাকে গোপনে বিপুল পরিমাণে পরমাণু ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত করে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তুলেছে। মার্কিন এই প্রচার যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল, তা প্রমাণিত। নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ ইরাকবাসীকে হত্যা করে ইরাক দখলের পরও পরমাণু অস্ত্রের একটি কণাও আমেরিকা বের করতে পারেনি। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি বারবার তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও পরমাণু অস্ত্র তৈরির কোনও সন্ধান পায়নি। মার্কিন জনগণের কাছে বুশ মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছেন। কিন্তু কেন এই মিথ্যাচার, কী এর পেছনের স্বার্থ, তা এখনপরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিপুল তৈলভাণ্ডার লুণ্ঠনই যে ইরাক যুদ্ধের প্রকৃত কারণ, তা আগেই রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর জানা হয়ে গিয়েছিল। এখন তথ্য-প্রমাণের মধ্য দিয়ে তা বেরিয়ে আসছে। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে — চারটি বৃহৎ মাল্টিন্যাশানাল তেল কোম্পানির মিলিত জোট, 'ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি' (আই পি সি), যারা অতীতে ইরাকের তেল নিয়ন্ত্রণ করত, তারা আবার ইরাকে ফিরে এসেছে। সাদ্দাম হুসেনের জন্যই একদা তাদের ইরাক ছাড়তে হয়েছিল।

এক্সন, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, শেল ও টোটাল, এই চারটি দৈত্যাকার একচেটিয়া তেল কোম্পানিকে নিয়ে গঠিত আই পি সি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী একচেটিয়া জোট। কয়েক মাস হল তারা ইরাকে ফিরেছে। তেল উৎপাদনের পরিকাঠামো সংস্কার চুক্তির মধ্য দিয়ে তারা আবার ইরাকের তেলের উপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইরাক ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে তেল উৎপাদনকারী আরও দেশ আছে। তৈলসম্পদে বৃহত্তম দেশ সৌদি আরব রয়েছে। তা সত্ত্বেও ইরাক মার্কিন আক্রমণের লক্ষ্য হল কেন?

এই প্রশ্নে সদুত্তর পেতে একটু পিছনের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। ১৯৭২ সালের আগে পর্যন্ত ইরাকি তেলের উপর ইরাকের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আই পি সি জোট, অর্থাৎ ওই চারটি মাল্টিন্যাশানাল তেল কোম্পানিই ইরাকের তেল কবজা করে রেখেছিল। ১৯৫৮ সালে গণঅভ্যুত্থানের পরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোট বাগদাদ চুক্তি (পরবর্তীকালে এর নাম হয় সেন্টো) থেকে ইরাক বেরিয়ে আসে। ইরাকের ওপর সাম্রাজবাদী ব্রিটিশ কর্তৃত্বের আংশিক অবসান হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইরাকের তেল আই পি সি'র করায়ত্ত ছিল। ১৯৬৮ সালে বাথ পার্টির নেতৃত্বে একটা স্থায়ী সরকার গঠনের পরই ইরাক তেলসম্পদকে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কবল থেকে বের করে আনার কথা ভাবতে পেরেছিল।

ইরাকের প্রয়োজন ছিল তৈলকূপ থেকে তেল উত্তোলন ও পরিশোধনের প্রযুক্তি ও পুঁজি। কিন্তু বিপদ ছিল অন্যত্র। বিদেশ থেকে পুঁজি ও প্রযুক্তি আনতে গেলেই সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়তে হবে। ১৯৫২ সালে ইরানে কীভাবে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সি আই এ মুহম্মদ মোসাদেকের সরকারকে উৎখাত করেছিল, তা ইরাকি নেতাদের জানা ছিল। তাই ইরাকের দরকার ছিল, বিশ্বরাজনীতির দ্বন্দ্ব সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে সরকার উচ্ছেদের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এড়িয়ে চলা।

এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতো যোগ্যতা নিয়ে সাদ্দাম হুসেন ক্ষমতায় আসার পরই ইরাক নিজস্ব তৈলসম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করে। তেলের বিপুল আয় থেকে ইরাকে একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী লাভবান হলেও ইরাকের সামাজিক জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। ঐতিহাসিক পিটার ক্যালভোকোরিসি লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, "ইরাকের এই পালাবদল কেবল সামরিক অর্থে ঘটেনি। ইরাক সরকার নিরক্ষরতা দূর করা ও শিক্ষাবিস্তারের কাজ হাতে নিয়েছিল, প্রযুক্তিবিদ্যার ট্রেনিং চালু করেছিল, শিল্প ও কৃষির বিকাশ ঘটিয়েছিল। ফলে যে ইরাক তার প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৭৫ ভাগই আমদানি করত, সেই ইরাক খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছিল। আর সবটাই করা হয়েছিল তেল বিক্রির আয় থেকে" (দ্র ঃ ওয়ার্ল্ড পলিটিকস সিন্স ১৯৪৫)। ৭০ দশকের সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সংকটকে কাজে লাগাতে সাদ্দাম হুসেন দ্বিধা করেননি। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ তখন এক কঠিন সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। একদিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত, অন্যদিকে ডলারের দাম পড়ে যাওয়ায় মার্কিন সহ গোটা সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া প্রবল বাণিজ্য সংকটের মুখোমুখি। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণ যেমন স্বাধীনতার দাবি তুলছিল, আরব দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণ সাম্রাজ্যবাদের কবজা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক একাধিপত্যের জায়গায় বিপুল শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান বিশ্বরাজনীতির অঙ্গনে সাম্রাজ্যবাদের একাধিপত্য ঘুচিয়ে দেওয়ার অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিল। এই অবস্থায় ইরাকে সাদ্দাম হুসেন তেলসম্পদের জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বশংবদ ইজরায়েলকে দিয়ে আরব দেশগুলির উপর সামরিক হানাদারি চালিয়েও সফল হতে পারেনি। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির সংগঠন 'ওপেক' দীর্ঘদিন ধরে থাকলেও তার স্বাতন্ত্র্য বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। সাদ্দাম হুসেনের নেতৃত্বে সেই ওপেক নিজেদের দেশের তৈলসম্পদের ওপর সাম্রাজ্যবাদের কবজা খর্ব করার চেষ্টা শুরু করে— যার প্রথম পদক্ষেপই ছিল তেলের দাম নির্ধারণের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখার চেষ্টা। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ এমনিতেই প্রবল অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছিল। তার ওপর ওপেকভুক্ত দেশগুলি তেলের দাম নির্ধারণ করলে তারা তীব্র মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পড়বে, এই আশঙ্কা দেখা দিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির জনগণের মধ্যে দেখা দেওয়া জাতীয়তাবাদী চেতনা, সাম্রাজ্যবাদের নড়বড়ে অবস্থা ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সে সময় স্ট্যালিনের নেতৃত্বে অসাধারণ যোগ্যতার সাথে কাজে লাগিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদকে দারুণ সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়। সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে ও গোটা দুনিয়ায় জনমত গড়ে তোলা এবং ন্যায় ও প্রগতির শক্তিগুলিকে নৈতিক বল জোগানোর মধ্য দিয়ে স্ট্যালিন নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদকে বহুলাংশে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কৃষিকে লাভজনক করতে সরকারের কি কিছুই করার নেই

রাজ্যের আলুচাষিরা গভীর সংকটের সম্মুখীন। আলুর ফলন যদি মার খায়, তাহলে কৃষকের সর্বনাশ। আবার আলুর ফলন যদি ভাল হয়, উৎপাদন যদি রেকর্ড মাত্রায় হয়, তাহলেও তাদের সমস্যা। কারণ তখন ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। সরকার ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করে না। এই দুর্গতি থেকে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে না। এই উভয় সংকটে পড়ে আলুচাষিরা বিপর্যস্ত।

এই সংকট থেকে বাঁচতে হলে সংকটের মূল কারণটিকে সর্বাগ্রে অনুধাবন করা দরকার। আলুসহ সমস্ত কৃষিপণ্যে কৃষক মার খাচ্ছে প্রধানত দুটো কারণে, এক, কৃষিতে উৎপাদন খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, দুই, খরচের সাপেক্ষে কৃষিপণ্যের যুক্তিসঙ্গত ন্যায্য বা লাভজনক দাম কৃষক পাচ্ছে না। সার, বীজ, কীটনাশকের দাম মালিকরা, বৃহৎ ব্যবসায়ীরা সরকারি নিয়ন্ত্রণহীনতার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো বাড়িয়ে যাচ্ছে; ডিজেল, বিদ্যুতের দামও বাড়াচ্ছে প্রচুর — যার ফলে সেচের খরচ, চাষের খরচ অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষকের উৎপাদিত ফসল সরকারি উদ্যোগে কেনার ব্যবস্থা না থাকায় বৃহৎ ব্যবসায়ীরা, তাদের এজেন্টরা, ফড়েরা দয়া করে যে দাম দেয় সেই দামেই বিক্রি করতে বাধ্য হয় তারা। দেখা যাচ্ছে, মুষ্টিমেয় মালিক-বৃহৎ ব্যবসায়ী চক্র বাজারের উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকার সুযোগে ইচ্ছামত চাষিদের শোষণ করে চলেছে।

যে অর্থনৈতিক নিয়মে কৃষক এভাবে শোষিত বঞ্চিত হচ্ছে তাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বলা হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি শব্দটাই সাধারণভাবে শ্রমিক-কৃষকদের কাছে একটা ঘৃণার বিষয়। সেই কারণে পুঁজিপতিরা ও তাদের চিন্তায় প্রভাবিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা পুঁজিবাদী অর্থনীতির গায়ে বাজার অর্থনীতি নামক একটা জামা পরিয়ে দিয়েছেন। এখন এই মুক্ত বাজার অর্থনীতিরই জয়ধ্বনি করা হচ্ছে। এই বাজার অর্থনীতির বাজার মানে নিছক বেচাকেনার একটা জায়গা মাত্র নয়। এই মুক্ত বাজার মুক্তও নয়, এই বাজারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে। এই মুক্তবাজারে চলছে পুঁজির দাপট। পুঁজিপতিরাই সবকিছু নির্ধারণ করছে। চাষির নিজের উৎপাদিত আলুর দাম নির্ধারণের অধিকার তার হাতে নেই। দাম ঠিক করছে সেই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা — যারা কিনতে এসেছে। তারা কৃষককে যথাসম্ভব কম দামই দেয়। তাহলে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া কি আদৌ সম্ভব? ফলে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার প্রশ্নটি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে।

তার মানে কি এই— যতদিন পুঁজিবাদ উচ্ছেদ না হচ্ছে ততদিন এভাবে প্রতারত হওয়াকেই কৃষক ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নেবে? এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কৃষকের স্বার্থে সরকারের কি কিছুই করণীয় নেই? দেখা যাক, কী কী করার আছে।

প্রথমত, সরকার সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে যুক্তিসঙ্গত লাভজনক দাম দিয়ে আলু কিনে গুদামজাত করতে পারে এবং এভাবে দালাল - ফড়েদের খপ্পর থেকে কৃষকদের বাঁচাতে পারে। আবার, সরকার এই আলু ন্যায্য দামে বিক্রি করে খুচরো ক্রেতাদেরও মূল্যবৃদ্ধির ছোবল থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সরকার এটা করছে না।

দ্বিতীয়ত, সরকার আলু বীজের দাম কমাতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে কোনও 'পটাটো রিসার্চ ইন্সটিটিউট' নেই। এই ধরনের ইন্সটিটিউট গড়ে এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার উপযোগী আলু বীজের বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে পারে। সরকারি উদ্যোগে আলু বীজ বিক্রির ব্যবস্থা করা হলে কৃষকরা অনেকটা সুরাহা পেতে পারে।

তৃতীয়ত, সার ও কীটনাশকে ভরতুকি বাড়ানো দরকার। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা যাতে সারের কালোবাজারি করে দাম বেআইনিভাবে বাড়াতে না পারে সে ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে। বাস্তবে, সার ব্যবসায়ীরা শাসক দল সিপিএমের প্রশ্রয়ে সারের কালোবাজারি করেই চলেছে। এসব বন্ধ হওয়া দরকার।

চতুর্থত, অন্যান্য রাজ্য সরকার যেমন করে বিদ্যুতে ভরতুকি দিয়ে কোথাও বিনা পয়সায়, কোথাও ২৫ পয়সা ইউনিটে কৃষকদের বিদ্যুৎ দিচ্ছে, এরাজ্যের সিপিএম সরকারও তা করতে পারে। এটা করলে কৃষকদের সেচের খরচ অনেকটা কমতে পারে। একইভাবে সুলভ মূল্যে ডিজেল সরবরাহ করতে পারে সরকার।

পঞ্চমত, প্রাকৃতিক কারণে ফসল নষ্ট হলে সরকার তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে পারে। কৃষকদের শস্যবিমার ব্যবস্থা করতে পারে।

এছাড়া পর্যাপ্ত সংখ্যক হিমঘর স্থাপন, আলু থেকে রকমারি খাদ্য তৈরি করতে 'ফুড প্রসেসিং' শিল্প গড়ে তোলা, বহির্রাষ্ট্রে আলু রপ্তানি, ঋণগ্রস্ত আলুচাষিদের ঋণমকুব প্রভৃতি বিষয়ে সরকার ভূমিকা নিতে পারে।

এই দাবিগুলি পূরণে সরকারকে বাধ্য করার জন্য ইতিমধ্যেই চাষিরা সোচ্চার হয়েছে, গড়ে উঠেছে আন্দোলনের হাতিয়ার সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটি। এই কমিটি জেলায় জেলায় এবং রাজ্যভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

আলুচাষ গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আলু চাষের সঙ্গে প্রায় দেড় কোটি পরিবার যুক্ত। এর সঙ্গে যুক্ত লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ফলে এই চাষকে লাভজনক রাখা একটা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অথচ, কৃষি আর লাভজনক নয়, একথা বলে জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ করার সর্বনাশা পথ নিয়েছে সিপিএম সরকার। আজ প্রয়োজন তাকে প্রতিহত করা। একইভাবে প্রয়োজন কৃষিকে লাভজনক রাখতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করা। এই লক্ষ্য নিয়ে এস ইউ সি আই কৃষকদের সংগঠিত করে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

বহরমপুরে সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির বিক্ষোভ

সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ২৭ আগস্ট জেলাশাসকের কাছে বিক্ষোভ অবস্থান করে ডেপুটেশন দেয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণ গ্রহণকারী বেকার যুবকদের উপর পুলিশি ও প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করা, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতার প্রতিবাদে এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন ও সকল বেকার যুবকের কাজের দাবিতে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে প্রায় দুই শতাধিক যুবক-যুবতী অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাসের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধিদল এ ডি এম-এর কাছে দাবিপত্র পেশ করে। তিনি সমস্ত দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করে অতি দ্রুত সরকারি উচ্চ মহলে বিষয়টি জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক ডাঃ গোলাম জিকরিয়া ঘোষণা করেন, বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করার নামে সরকার প্রতারণা করছে।

রাজ্য সম্পাদক সরকারের স্বনির্ভর প্রকল্পের অসারতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বেকার যুবকদের প্রতি প্রতারণার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে সকল বেকার যুবককে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

'ইরাক পেট্রো কোম্পানি' ফিরে এল ইরাকে

পাঁচের পাতার পর

কোণঠাসা করে ফেলে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতিতে স্ট্যালিন-নীতির জের ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে তখন পুরনো ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ঢুকছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সেই অবস্থায় ইরাকে তারা বিপদে পড়ে যায়। তেলসম্পদের অধিকারী দেশগুলি নিজেরা তেলের দাম নির্ধারণ করবে— এই বিষয়টি যত না অর্থনৈতিক, তার থেকে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বেশি। কারণ তেল উৎপাদক হিসাবে ওপেক দেশগুলি তেলের দাম বাড়াতে চাইলেও বৃহত্তম ক্রেতা হিসাবে তাতে লাগাম পরাবার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের থাকত। কিন্তু এর মধ্যে যে অশনি সংকেতটি ছিল, তা হল, এতদিনের পদানত দেশগুলির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, যেটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মেনে নিতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যে নিরঙ্কুশ মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সর্বদাই ইরাক ছিল বাধা, তাই সাদ্দাম হুসেনকে সরাবার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সুযোগ খুঁজছিল বহুদিন। পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। ইরাক দীর্ঘদিন ধরেই তথ্যপ্রমাণ সহ অভিযোগ আনছিল যে, যৌথ মালিকানাধীন তৈলকূপ থেকে কুয়েত বাড়তি তেল তুলে নিচ্ছে। বিশ্বশক্তিগুলির কেউই ইরাকের এই অভিযোগের বিচার ও ব্যবস্থা নেয়নি। ক্ষুব্ধ ইরাক মার্কিন ফাঁদে পা দিয়ে, মার্কিন গোপন সম্মতির ভিত্তিতে কুয়েত আক্রমণ করা মাত্রই তাকে অজুহাত করে 'জর্জ বুশ সিনিয়র' ইরাক আক্রমণ করে। তারপর দশ বছর কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে সমৃদ্ধ ইরাককে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শ্মশানে পরিণত করে। তারপর, 'ইরাক গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে' এই অজুহাত তুলে জর্জ বুশ জুনিয়র দ্বিতীয়বার ইরাক আক্রমণ করে অত্যাধুনিক অস্ত্রের নৃশংস প্রয়োগে ইরাকে গণহত্যা চালায়।

এখন পরিষ্কার যে, মালটিন্যাশানাল কোম্পানির স্বার্থে একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস মার্কিন সরকার ইরাক আক্রমণ করেছে। ইতিমধ্যে এও প্রকাশ পেয়েছে যে, ইরাক যুদ্ধের সামরিক কন্ট্রাক্ট ও ইরাকে পুনর্গঠন কর্মসূচি থেকে লাভবান হয়েছে মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানি হ্যালিবার্টন, বিটচেল ইত্যাদি, যেগুলির অন্যতম মালিক হল মার্কিন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আমলাদের কয়েকজন। একচেটিয়া তেল কোম্পানি আই পি সি'র ফিরে আসা সেই স্বার্থকেই আর একবার প্রমাণ করেছে। আগ্রাসন ও দখলদারির মধ্য দিয়েই একমাত্র আই পি সি'র পক্ষে ইরাকে ফিরে আসা সম্ভব ছিল। আই পি সি'র এক মুখপাত্র বলেছেন, আমরা একশো বছর ইরাকে থাকতে চাই। কিন্তু এ কল্পনা আকাশকুসুম। যতদিন দখলদারি থাকবে, ইরাকের সংগ্রামী জনগণ বীরের মতই লড়বে। সাদ্দাম হুসেনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে এ লড়াই বন্ধ করা যায় না। ইতিহাস বলছে, জয় শেষপর্যন্ত হবে ইরাকি জনগণের।

(তথ্যসূত্র ঃ নিউ ওয়ার্কার, ৪.৭.০৮)

রাজ্য জুড়ে বিদ্যুতের আলো বর্জন

কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ২৭ আগস্ট আলো বর্জনের সময় মোমবাতি নিয়ে মিছিল

উত্তরপ্রদেশকে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ করার প্রস্তাব কি জনস্বার্থে?

বড় রাজ্য হওয়ার কারণে উত্তরপ্রদেশকে ভাগ করার প্রস্তাব অনেকবার উঠেছে। ইতিপূর্বে উত্তরপ্রদেশকে ভাগ করে উত্তরাখণ্ড নামে এক নয়া রাজ্য গড়েও উঠেছে। বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর পক্ষ থেকে পুনরায় উত্তরপ্রদেশকে ভাগ করে পৃথক পূর্বাঞ্চল, বুন্দেলখণ্ড এবং হরিৎপ্রদেশ নামে ছোট ছোট রাজ্য গড়ার প্রস্তাব উঠেছে। আশা ব্যক্ত করা হচ্ছে যে, এইভাবে ভাগ করলে এই সমস্ত পিছিয়ে-পড়া এলাকার উন্নয়ন সম্ভব হবে।

গরিবি, অনাহার, বেকারি প্রভৃতি সমস্যায় আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া এই বিশাল রাজ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সেচের সমস্যা, সার-বীজের দামবৃদ্ধি এবং বিদ্যুত ঘাটতির ফলে চাষের খরচ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ছোট ও মাঝারি চাষির পক্ষে চাষবাস করে জীবনযাপন ও পরিবার প্রতিপালন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বুন্দেলখণ্ডে দীর্ঘদিন ধরেই আকাল চলছে। সেচের ব্যবস্থা তো বহু দূরের কথা, পানীয় জল পাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া এইসব এলাকায় দাঙ্গাবাজ প্রভাবশালী লোকেরা গায়ের জোরে জমি দখল করার ফলে আসল জমির মালিক নিজের জমিতে মজুরের কাজ করে। ফলে গরিবি আরও বাড়ছে। পূর্বাঞ্চলের আর্থিক পরিস্থিতিও খুব খারাপ।

গোরখপুরে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ভদোহী-র আন্তর্জাতিক মানের কার্পেট শিল্প একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। চুনারের চীনামাটি শিল্পও প্রায় বন্ধ। ডালা, চুর্ক এবং চুনারে সিমেন্ট কারখানা বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগই সেখানে নেই। পূর্বাঞ্চলের ৩৬টি চিনিকল বন্ধ। বারাণসীতে রেলের লোকো ওয়ার্কশপ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেখানকার পর্যটন শিল্পও হতাশাব্যঞ্জক। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে বিগত চার-পাঁচ বছর ধরে ভয়ঙ্কর খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে। সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ, বছরের পর বছর ধরে চলা দুর্নীতি এবং অপশাসনে এই সংকট আরও গভীর হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় ১৩টি জেলার ৬৯০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল। এই অঞ্চলের মতো খরা এবং খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবের পরিস্থিতি আশেপাশের কিছু এলাকাতেও রয়েছে। এই এলাকায় সব মিলিয়ে প্রায় দু'কোটি মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত। এক সময় দেশের শিল্প-শহরের তালিকায় কানপুরের নাম উল্লেখিত হত। কিন্তু বর্তমানে সেখানকার অধিকাংশ বড় শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। গোটা উত্তরপ্রদেশে কোথাও নতুন শিল্প, কল-কারখানা খোলার পরিস্থিতি নেই, যার ফলে লক্ষ লক্ষ যুবক আজ বেকার। চাষবাসও লাভজনক না হওয়ায় কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে দিল্লি, মুম্বই, সুরাট প্রভৃতি শহরে গিয়ে কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

উত্তরপ্রদেশের এই সমস্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী ফয়দা তোলার উদ্দেশ্যে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি আসরে নেমে পড়েছে। কংগ্রেসের নতুন নেতা রাহুল গান্ধী এই রাজ্যে এসে সব সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে উত্তরপ্রদেশ ভাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। মায়াবতী এই রাজ্য ভেঙে নতুন নতুন রাজ্য গড়ার প্রস্তাব তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রীও বারাণসীতে গিয়ে 'পূর্বাঞ্চল' নামে আলাদা রাজ্য গঠন করার প্রস্তাব দিয়ে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী রাজধানীতে বলেছেন, কেন্দ্র যদি রাজি থাকে, তাহলে তিনিও রাজ্য ভাগ করার প্রস্তাবে রাজি আছেন।

এইভাবে যে প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি কোনও নতুন প্রক্রিয়া নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, জাতিবাদ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুবাদ পুঁজিপতিশ্রেণীর বহু পুরনো কৌশল। রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করা বা নতুন নতুন রাজ্য গঠনও সেই রাজনীতিরই অঙ্গ। মাদ্রাজ ভেঙে অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি হয়েছিল। মহারাষ্ট্র ভেঙে ১৯৬০ সালে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র আলাদা হয়েছিল। হিংসাত্মক নাগা আন্দোলনের পরিণতিতে ১৯৬৪ সালে নাগাল্যান্ড গঠিত হয়। একইভাবে পঞ্জাব ভেঙে হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ তৈরি হয়েছিল। উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় গঠন করেছিল বাজপেয়ী সরকার। নতুন নতুন রাজ্যের দাবি উঠছে অসংখ্য। পশ্চিমবঙ্গে গোর্খাল্যান্ডের দাবি উঠেছে, উঠেছে আসামে বোড়োল্যান্ড, মহারাষ্ট্রে বিদর্ভ, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের দাবি। জম্মু-কাশ্মীরে জম্মু ও লাদাখকে আলাদা করার দাবি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি তুলেছে। যখন উপরোক্ত জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য জনগণের সামনে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই, যখন জনগণের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করা একান্ত জরুরি — ঠিক সেই সময়ে একইভাবে উত্তরপ্রদেশকে খণ্ড খণ্ড করার কথা বলা হচ্ছে, যার সাথে জনসাধারণের কল্যাণের কোনও সম্পর্ক নেই। জনগণকে বলি দিয়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে আখের গোছানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি এবং সোনিয়া বা রাহুল গান্ধীর কংগ্রেসের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

যাঁরা ভাবছেন পৃথক পৃথক রাজ্য গঠিত হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বা খানিকটা হলেও সমস্যা মিটবে — তাঁদের আমরা বলতে চাই যে, আবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে তাঁরা যদি যুক্তির আধারে চিন্তা করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, ইতিপূর্বে ভারতে অনেক রাজ্যকে ভেঙে আলাদা আলাদা রাজ্য গঠন করা হয়েছে, যেগুলির কথা আমরা আগেই বলেছি। সেখানেও জনগণের কোনও মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়নি। যে পুঁজিবাদী শোষণের জন্য একটা বিশেষ রাজ্যের জনগণ শোষিত হচ্ছে, রাজ্যটি ভাগ করে দিলেও সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণই বহাল থাকবে এবং জনগণও শোষিত হতেই থাকবে।

যদি একটি রাজ্যকে ভেঙে দুটি বা তিনটি রাজ্য গঠন করা হয়, তাহলে সেই আলাদা আলাদা রাজ্যগুলিতে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ হতে পারে, মাইনে করা নতুন এক আমলাবাহিনী গড়ে উঠতে পারে এবং কিছু আঞ্চলিক পুঁজিপতি ও ধনী ব্যক্তির লাভ হতে পারে — কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে যে অন্ধকার ছেয়ে আছে, তা বিন্দুমাত্র দূর হবে না। এই কারণে ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি পৃথক রাজ্য গঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেসব রাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবনের মূল সমস্যাগুলি বিন্দুমাত্র লাঘব হওয়া দূরের কথা, লাগাতার বেড়েই চলেছে। এর ফলে আমরা কী দেখছি? জনগণের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলি সমাধান না করায় স্বাভাবিকভাবেই জনতার মনে তীব্র বিক্ষোভ গড়ে ওঠে। তার ফলে কখনও কখনও জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ফেটে পড়ে। কিছু ভাঙচুর হয়, পুলিশ লাঠি-গুলি চালায়। ফলে কিছু লোক আহত হয় এবং কিছু মানুষ মারাও যায়। এরকম হলে জনগণের সরকারবিরোধী মানসিকতা আরও তীব্র হয় এবং তাকে পুঁজি করে নির্বাচনসর্বস্ব বিরোধী দলগুলি ফয়দা তোলে। কখনও কখনও অবস্থা এমন হয় যে, সরকারের পতন ঘটার মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়।

এইরকম পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দলগুলি জনতাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে নানা লোকঠকানো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা প্রচার করে, প্রদেশকে ভেঙে ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত করলে জনগণের অবস্থার নাকি উন্নতি হবে। এমনও বলা হয় যে, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, বেকারির সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, চাষবাসের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা— এসবের কারণ রাজ্যটির বৃহৎ আয়তন। ফলে যদি রাজ্যের আয়তন ছোট করে দেওয়া হয়, তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এইসব যুক্তি তুলে সরকার নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী নির্বাচনে গদি দখলের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

অথচ বাস্তব সত্য হল, এইসব সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদ। যতদিন শোষিত জনতার সচেতন বিপ্লবী আন্দোলনের আঘাতে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করা না যাচ্ছে, ততদিন এই সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এ কাজ কোনও নির্বাচনসর্বস্ব ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে করা অসম্ভব। একমাত্র একটি সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলই এ কাজ করতে পারে। তার জন্য কর্তব্য হল, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে রাজ্যের জনগণকে সংগঠিত করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা। গণআন্দোলনের মাধ্যমেই এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভ্রান্তকারী ভাবধারাকে আমরা পরাস্ত করতে পারি। এই পথেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিপ্লবী আন্দোলনকেও আমরা শক্তিশালী করতে পারি। উত্তরপ্রদেশের শোষিত মানুষের সামনে সম্মানজনকভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচবার এটাই একমাত্র রাস্তা।

বালুরঘাটে আলু চাষিদের কনভেনশন ও ডেপুটেশন

১৯ আগস্ট বালুরঘাট শহরে বিক্ষোভ দেখাল দক্ষিণ দিনাজপুরের আলুচাষিরা। ঐ দিন বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে আলুচাষিদের কনভেনশন সংগঠিত হয়। কনভেনশনের পর চাষিরা জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক ডেপুটেশন নেন। রাজ্যের সংকটগ্রস্ত ৫০ লক্ষ আলুচাষি পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি অবিলম্বে পূরণের জন্য জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি রাখেন। তাঁদের দাবি, ১) প্রতিটি আলুচাষির জন্য সরকারকে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে, ২) প্রতি বছর নভেম্বর মাসেই সরকারকে আলুর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে, ৩) আলু উৎপাদক জেলাগুলির প্রতিটি অঞ্চলে ক্রয়কেন্দ্র খুলতে হবে, ৪) এ বছর হিমঘরের ভাড়া সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে, ৫) সার, বীজ ও কীটনাশকের কালোবাজারি বন্ধ করে সস্তা দরে সরবরাহ করতে হবে, ৬) আলুচাষিদের বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, ৭) সমস্ত আলুচাষিকে স্বয়ংক্রিয় বিমার আওতায় আনতে হবে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক দাবিগুলি সুবিবেচনার জন্য তাঁদের নোট লিখে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলে জানান। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সাগর মোদক। কনভেনশন থেকে সাগর মোদককে সভাপতি ও নিরঞ্জন মণ্ডলকে সম্পাদক করে সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা গঠিত হয়।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে ডেপুটেশন

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি, বাঁকুড়া জেলার উদ্যোগে ২৫ আগস্ট বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সুচিকিৎসার দাবিতে রাস্তা অবরোধ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির দাবি ঃ ১) হাসপাতালকে বেসরকারীকরণ করা চলবে না, ২) পথ্যের চার্জ সহ অন্যান্য পরীক্ষার চার্জ বাতিল করতে হবে, ৩) ২৪ ঘন্টা এক্স রে, ইসিজি, অপারেশন থিয়েটার চালু রাখতে হবে, ৪) বেডের সংখ্যা বাড়াতে হবে, ৫) সিনিয়র ডাক্তারদের হাসপাতালে উপস্থিত থাকতে হবে, ৬) দালালচক্র ও স্বজনপোষণ রোধ করতে হবে। বহু আগে থেকে এই ডেপুটেশনের সংবাদ জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ফলে আউটডোরের সামনে বাস রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কমিটির সদস্য বিদ্যুৎ শীট বলেন, প্রসূতি বিভাগ সহ প্রতি ওয়ার্ডেই একই বেডে একাধিক রোগীকে থাকতে হয়; ইন্ডোরে ঢুকলেই দেখা যায় বেডের অভাবে রোগীরা মেঝেতে কষ্ট করে শুয়ে আছেন। এক্স রে রিপোর্ট পেতে একজনকে ৩ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, বহুক্ষেত্রে ততদিনে রোগী মারাও যান। কমিটির সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকার বলেন, হাসপাতালের অত্যন্ত বেহাল অবস্থা। জীবনদায়ী ওষুধ পাওয়া যায় না, খাবার নিম্নমানের, যন্ত্রপাতির অভাবে অপারেশন বন্ধ থাকে, বাইরে থেকে সুঁচ-সুতো পর্যন্ত কিনে দিতে হচ্ছে। এই কারণেই মানুষকে আজ রাস্তা অবরোধে নামতে হচ্ছে।

প্রায় এক ঘন্টা অবরোধ চলার পর পুলিশ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ডেপুটেশন নেন হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ও ভাইস প্রিন্সিপাল। দাবিগুলি যুক্তিসঙ্গত বলে কর্তৃপক্ষ মেনে নেন এবং সমাধান করার আশ্বাস দেন। কমিটির সম্পাদিকা দাবি করেন, হাসপাতালে সরকারের পক্ষ থেকে যে কমিটি করা হয়েছে, তার মধ্যে জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির প্রতিনিধি রাখতে হবে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

এ লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে

একের পাতার পর

এটা যথার্থ শিল্পায়ন নয়। এই হুগলি জেলায় গঙ্গার দু'ধারে শত শত কারখানা বন্ধ। শিল্পাঞ্চল এখানে শ্মশান, খাঁ খাঁ করছে। আজকের এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী যুগে কোথাও শিল্পায়ন হচ্ছে না, শিল্পের ধ্বংসসাধন হচ্ছে। আমরা চাই শিল্প হোক। কিন্তু শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা। শিল্পায়ন করতে হলে এই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে হবে। পুঁজিপতিদের আজ বাজার নেই। বাজারসংকট বলেই খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি আসছে। এর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র চাষি, গরিব চাষি, খেতমজুর, খুচরো ব্যবসায়ী — সকলে ঐক্যবদ্ধ একই দাবিতে, একই স্বার্থে তারা ঐক্যবদ্ধ।

আপনাদের শত্রু কে? শত্রু এদেশের টাটা-আম্বানিরা, এদেশের পুঁজিপতিরা। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির সরকার হচ্ছে ওদের গোলাম। ওরা গদির জন্য, মন্ত্রীত্বের জন্য টাটা-আম্বানিকে তুষ্ট করছে; সাম্রাজ্যবাদকে এদেশ লুট করার সুযোগ করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ লুট করার জন্য সিপিএম দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির সাথে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকেও ডেকে আনছে। এইভাবে যারা সাম্রাজ্যবাদের গোলামি করছে, একচেটিয়া পুঁজির গোলামি করছে, তারাই দেখুন, কলকাতায় আজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মিছিল করছে মানুষকে ঠেকাবার জন্য।

আমরা শিল্প চাই। এই পশ্চিমবাংলায় প্রচুর অকৃষি জমি পড়ে আছে, সেখানে শিল্প হতে পারে। আপনারা কি জানেন, এই খড়্গপুরে অকৃষি জমি ছিল, যেখানে টাটা কারখানা করতে পারত? টাটা রাজি হয়নি। সিঙ্গুরে এসেছে। কেন? কারণ এখানে কারখানা করলে টাটা অনেক বেশি লাভ করবে। এক লাখ টাকার গাড়ি কার জন্য? টাটা বিশ্বের গাড়ির বাজার গ্রাস করবে। তাতে তার লাভ বাড়বে। তার জন্যই সিঙ্গুরে গরিব চাষিদের উৎখাত করতে হবে। এই হচ্ছে তার শর্ত। এখানে আমাদের দেশে গরিব চাষি, খেতমজুর, খুচরো ব্যবসায়ী — এদের জীবনের কোনও মূল্য নেই। এদের বাঁচার কোনও প্রয়োজন নেই। একমাত্র প্রয়োজন টাটা যাতে আরও লাভ করতে পারে, আম্বানি যাতে আরও লাভ করতে পারে। এর জন্যই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, রাজ্যের সিপিএম সরকার রয়েছে। ফলে এ লড়াই গরিব মানুষের লড়াই। এ লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াইতে গরিব চাষি, খেতমজুর, শহরের শ্রমিক, মধ্যবিত্ত জনগণ— সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র একদিন বলেছিলেন, মিথ্যা আর অন্যায়ের সাথে আপস করা হচ্ছে নিকৃষ্টতম অপরাধ। আমাদের নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ব্যক্তি হিসাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারলে সে মানুষ নামেরই যোগ্য নয়। আমরা মার্কসবাদী দল। সিপিএম মার্কসবাদী নয়। গান্ধীবাদীদের মধ্যেও ভণ্ড আছে, খাঁটি আছে। মার্কসবাদীদের মধ্যেও ভণ্ড আছে, আবার খাঁটিও আছে। আমরা মার্কসবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে লড়ছি, মমতা ব্যানার্জী গান্ধীবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে লড়ছেন। এই গান্ধীবাদের ঝাণ্ডা যতক্ষণ গণআন্দোলনের পক্ষে, লড়াইয়ের পক্ষে, ততক্ষণ আমাদের ঐক্য থাকবে, আমরা এগোব। আমাদের দলের যা শক্তি তার সবটাই নিয়োগ করেছি এই গণআন্দোলনের পক্ষে। আপনারা দেখছেন, প্রতিদিন আমাদের ছোট বড় মিছিল এখানে আসছে। পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায়, গ্রামে-শহরে আমরা অসংখ্য মিটিং করছি, লক্ষ লক্ষ হ্যান্ডবিল বিতরণ করছি। সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন যে মিথ্যা কুৎসা রটাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে এই কথাগুলো মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। আমরা জিতব। আপনারা জয়লাভ করবেন। একমাত্র লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই নন্দীগ্রাম জয়লাভ করেছে। কোনও আইনের জোরে, আদালতের জোরে, সরকারের জোরে নয় — লড়াইয়ের জোরে, রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে নন্দীগ্রাম জয়লাভ করেছে। আপনারা লড়াই চালিয়ে যান, তাহলেই সিপিএম সরকারের উদ্ধত মাথা নন্দীগ্রাম যেমন নামিয়ে দিয়েছিল, আমরা প্রাথমিকে ইংরাজি চালুর আন্দোলনের সময়েও বছরের পর বছর লড়াই করে মাথাকে নুইয়ে দিয়েছিলাম, সিঙ্গুরের এই আন্দোলনও তেমনই জয়লাভ করবে। সিঙ্গুরের এই আন্দোলন গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন। আপনারা দেখুন, টাটার পক্ষে গোটা দেশের পুঁজিপতিরা এসেছে, সাম্রাজ্যবাদীরা এসেছে। ওরা আতঙ্কিত, কারণ গরিব মানুষ মাথা তুলছে, তারা লড়ছে, প্রতিবাদ করছে, দাবি আদায় করছে। সিঙ্গুর প্রশ্নে দেশি পুঁজিপতিরা, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শ্রেণীস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ। অন্যদিকে গোটা দেশের চাষি, খেতমজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্তরাও তাদের শ্রেণীস্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, রাজনীতি আসলে দুটি। একটা হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের গোলামি করার গদির রাজনীতি, মন্ত্রীত্বের রাজনীতি। আরেকটা হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, লড়াই এবং দাবি আদায় করার রাজনীতি। আমরা এই দ্বিতীয় রাজনীতির পক্ষে এবং তার ভিত্তিতে আন্দোলন চলছে। আমরা এই আন্দোলনের সাথে সমস্ত শক্তি নিয়ে আছি এবং থাকব। আপনারা যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য আপনাদের আবার আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধে ওড়িশা সরকারকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে — কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৭ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, ওড়িশার কন্ধমাল জেলার বরাখানা, টিনাবোলি, সারঙ্গারা, রাইকিয়া প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে যেভাবে নারী-শিশু সহ বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, এক মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং প্রধানত সংখ্যালঘু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনগণের ঘরবাড়ি ও উপাসনাস্থলে তাণ্ডব চালানো হয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করি। সংবাদে প্রকাশ, আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখেই, সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ খুঁচিয়ে তুলে জনগণকে সম্প্রদায়গত বিভাজনে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপি-র মতো শক্তিগুলি এই বীভৎস দাঙ্গা ঘটিয়েছে।

২৩ আগস্ট লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী ও তাঁর চারজন অনুগামীকে যেরকম নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে, তারও তীব্র নিন্দা করেন কমরেড মুখার্জী।

কন্ধমালে দীর্ঘ সময় ধরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, তাকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে ওড়িশা সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছে, তাকে পক্ষপাতমূলক বলে অভিহিত করে কমরেড মুখার্জী বলেছেন, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা কড়া হাতে বন্ধ করার প্রশ্নে ওড়িশা সরকারের ভূমিকার মধ্যে শোচনীয় ব্যর্থতাই কেবল নেই, বস্তুত, এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালাতে সরকারই পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে পরোক্ষে সাহায্য করেছে।

কন্ধমালের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছেন, তাঁরা যেন চরম সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সকল প্ররোচনা উপেক্ষা করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মেহনতি জনগণের ঐক্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। ওড়িশা সরকারের কাছেও তিনি দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন নেভানোর জন্য, আরও হত্যা বন্ধ করার জন্য সরকারকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পরিস্থিতি দাবি করলে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করতে হবে।

সিঙ্গুরের আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের সংহতি সমাবেশ

সিঙ্গুর আন্দোলনের সমর্থনে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের আহ্বানে ৩০ আগস্ট কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক তরুণ সান্যালের সভাপতিত্বে এই সভায় বিভাস চক্রবর্তী, মিরাতুন নাহার, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দ সান্যাল, সুজাত ভদ্র, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, দিলীপ চক্রবর্তী, অর্পিতা ঘোষ, তরুণ নস্কর, প্রেমাংশু দাশগুপ্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তপন রায়চৌধুরী, ব্রাত্য বসু, অমিতাভ ব্যানার্জী, সব্যসাচী দেব, অজন্তা ঘোষ প্রমুখ। সিঙ্গুরের বর্তমান অবস্থার জন্য সরকারকেই সম্পূর্ণ দায়ী করে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহার নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্মচারীদের এক মিছিল ৩১ আগস্ট সিঙ্গুর ধরনা সমাবেশে যোগ দেয়।

পাঠক-গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

গণদাবী পত্রিকা গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার। সেই কারণে সাধারণ মানুষের কাছে এই পত্রিকা পৌঁছাতে পত্রিকার দাম যথাসম্ভব কম রাখারই চেষ্টা করি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নিউজপ্রিন্ট, মুদ্রণ ও পরিবহণ খরচ এতটাই বেড়েছে যে, বর্তমান দামে পত্রিকা প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্রিকার দাম সামান্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছি। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি সংখ্যার দাম হবে ২ টাকা। আশা করি এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠক-গ্রাহকদের সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in